প্রযুক্তিই কি মানব সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে?

তুষার চক্রবর্তী

মানুষের হরেক পরিচিতির মধ্যে একটি হল, সে কারিগরি প্রাণী। সে এমন প্রাণী যা যন্ত্রতন্ত্র তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। সেই সব যন্ত্র কাজে লাগিয়ে মানুষ একদিকে যেমন নিজের হরেকরকম প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে প্রসারিত করে নিজেদের শরীর এবং মনের সীমা, পরিসীমা। মানব সভ্যতার মধ্যে প্রগতি বলে যাকে আমরা চিহ্নিত করি তারই অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে মানুষের এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা উন্নয়নের ঝোঁক। সভ্যতার গোড়া থেকেই প্রযুক্তির সঙ্গে প্রবহমান সংস্কৃতির গড়ে উঠেছিল এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায়, একদিকে যেমন প্রযুক্তির উত্থান ঘটছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে, অন্যদিকে প্রযুক্তি ডেকে আনছিল সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ। সংস্কৃতির যে বহিরাবরণ বা খোলস তার ভেতরকার উপাদান হিসেবে প্রযুক্তি থেকেই ঠাঁই করে নিয়েছিল, যা একটা সময় অবধি তেমন বিজ্ঞান নির্ভর ছিল না। তবে, আধুনিক যুগে পৌঁছে প্রযুক্তিবিদ্যা নতুন নতুন বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে যেন একেবারে ওতপ্রোতভাবে লেপ্টে নিল। প্রযুক্তির পরিবর্তন যত ত্বরান্বিত হল, ততই বিজ্ঞানশালাগুলি হয়ে উঠল আধুনিক প্রযুক্তির আঁতুরঘর। সমাজে বিরাজমান শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটা আপাত দূরত্ব তখন থেকেই তৈরি হয়ে গেল। এটা কেন ঘটল সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু, আলোচনায় দুটো ব্যাপার সর্বদাই মনে রাখতে বলব: ১) মানুষের মধ্যে প্রযুক্তিবুদ্ধি জন্ম নিয়েছিল সভ্যতার একেবারে আদি পর্বে, যখন বিজ্ঞান মঞ্চ এসে অবির্ভূত হয়নি। সুতরাং, ইতিহাসের বিচারে প্রযুক্তি ছিল বিজ্ঞানের পুরোগামী; ২) প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রযুক্তির পরিবর্তন সংস্কৃতির পরিবর্তনকে প্রভাবিত এবং ত্বরান্বিত করে।

সভ্যতার এই ইতিহাস মাথায় রাখলে প্রযুক্তি যে সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং সে নিজেও সংস্কৃতির একটি মৌলিক উপাদান, সেটা যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বিজ্ঞানের সংসর্গে এসে প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির

রামপ্রসাদ কিন্তু আলীলায় মনের আবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। আবাদ বনাম উৎকর্ষ বিবাদ তাঁর কাছে অবান্তর হয়ে গিয়েছিল। সেই রামপ্রসাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব যেন অনতিক্রম্য। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথই কি ইঙ্গবঙ্গ দুই কালচারে বিভাজনের হোতা অথবা অগ্রদূত?

মধ্যে আড়াল গড়ে উঠল কেন? তার একটা প্রধান কারণ আধুনিক যুগে এসে আমাদের শিক্ষালয় এবং পাঠক্রমে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যা ও প্রযুক্তি এদের সবাইকে একেবারে আলাদা আলাদা কুঠুরিতে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তাই এমন একটা ধারণা আজকের সমাজে রীতিমত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে যে সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে জল - অচল সম্পর্কটাই বুঝি স্বাভাবিক। প্রযুক্তি কেজো জিনিস এটা বুঝতে পারলেও সেটা যে মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সারাৎসার সেটা স্বীকার করতেও অনেকের তাই কেমন যেন অসুবিধে হয়। অথচ, প্রযুক্তি না বলে কলাকৌশল অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যবহার করলে কলা (বিদ্যা) এবং কৌশল অর্থাৎ প্রযুক্তির মধ্যে দুয়ের মিলমিশ এক পলকে ধরা পড়ে যায়। তখন প্রযুক্তি-রহিত কলাকৈবল্যতার কবলমুক্ত হয়ে ওঠা সহজ হয়।

মজার ব্যাপার হল, শিক্ষাক্রমে ঠাঁই পাবার পর প্রথম দিকে ইংরেজিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বলে যন্ত্রবিদ্যার পরিচয় দেওয়া হত। প্রযুক্তি ও যন্ত্রবিদ্যার সঙ্গে বলবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার সম্পর্ক সে যুগে এমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হত। আজ সেই পরিচয় সেকেলে বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজিকে আজ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বলার প্রয়োজন নেই, কেননা, প্রযুক্তির খাতির এখন পৃথিবীর সব দেশেই কলাবিদ্যাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গিয়েছে। বরং, কলাকে ছাপিয়ে উঠে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কৌশল বা টেকনোলজি। কেন এবং কী করে? মূলত সেটাই আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আজকের সমাজে জৈবপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটবিদ্যা এবং ন্যানো টেকনোলজির মতো নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং তাদের সাংস্কৃতিক অভিঘাত নিয়ে যে সব বিতর্ক উঠেছে তার পটভূমিতে এই আলোচনা এখন প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

তবে, সমালোচনার পাশাপাশি সকলকে এটাও মনে রাখতে বলব যে আগ্রাসী টেকনোলজির নেতিবাচক ভূমিকা বাদ দিয়ে ইতিবাচক দিক থেকেও প্রযুক্তির সংস্কৃতিকে দেখার সুযোগ আছে, প্রয়োজন আছে। কেননা, কেবল নেতির ওপর ভর করে এক কট্টর রকমের পরিবর্তন বিমুখ, প্রযুক্তি বিরোধী রক্ষণশীলতা আজ অনেক দেশেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এভাবে প্রযুক্তিকে রুখে দিয়ে সমাজ ও সভ্যতাকে নিশ্চল করে বাঁধবার প্রয়াস ডেকে আনতে পারে আরেক ধরনের মারাত্মক বিচ্যুতি। সুতরাং, বর্তমান যুগে আমাদের সেই ধরনের অপপ্রয়াস থেকেও নিজেদের তফাতে রাখতে হবে। এই ঘোর কুয়াশাচ্ছন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে, প্রবহমান প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক খরস্রোতের ভালো এবং মন্দ দুটোকেই তাই আজ বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রযুক্তির সংস্কৃতির অর্থভেদ

প্রযুক্তির সংস্কৃতি বলতে যে আমরা ঠিক কী বোঝাতে চাইছি সেটা নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কম করে তিনরকম অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করা যায়।

কথাটির একটি অর্থ হল প্রযুক্তির জন্য। প্রযুক্তি উদ্ভাবনা বা উন্নয়নের যে সংস্কৃতি প্রয়োজনীয় সেটা এখানে উদ্দিষ্ট বিষয়। এখানে সংস্কৃতি হল প্রযুক্তির উৎস, প্রণোদনা এবং পোষক। প্রযুক্তিবিদ বা বৃহত্তর সমাজ দুটো নিয়েই এই আলোচনা চালানো যায়।

দ্বিতীয় অর্থটি বিস্তারিত করে বললে দাঁড়ায় প্রযুক্তি প্রভাবিত সংস্কৃতি। এখানে প্রযুক্তি হল কারক উপাদান এবং সংস্কৃতি তার ফলাফল। প্রযুক্তিকে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চালক বলে মনে করেন অনেকেই, এবং তাঁরা বিষয়টিকে এভাবে দেখতে চাইতেই পারেন। বলা বাহুল্য যে এখানে প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির সম্পর্কের অভিমুখ বা দিশা প্রথমোক্ত অর্থের ঠিক বিপ্রতীপ। এখানে প্রযুক্তি উৎস এবং সমাজ ও সংস্কৃতি হল তার গ্রাহক উপাদান। প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চায় এটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। যারা সংস্কৃতির বিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাদের মধ্যেও অনেকেই এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। এইরকম দু - একজন চিন্তকের তত্ত্বকথা আমরা এই লেখায় সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

প্রযুক্তির সংস্কৃতির তৃতীয় যে অর্থ তাকে বিস্তারিত করে নিলে দাঁড়ায় প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদদের সংস্কৃতি। এখানে প্রযুক্তির যে নিজস্ব অন্তর্বৃত্ত, তার মধ্যে বিদ্যমান সংস্কৃতিকে প্রত্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, এই তৃতীয় ক্ষেত্রে যাহা

প্রযুক্তি তাই সংস্কৃতি। চিন্তক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা কখনও কখনও এই কাজটা করে থাকেন।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় তিনটি দিককেই একটু একটু করে স্পর্শ করে গেলেও আমরা প্রধান্য দিতে চাই প্রযুক্তির সংস্কৃতির উল্লিখিত দ্বিতীয় অর্থকে। প্রধানত প্রযুক্তি প্রভাবিত সংস্কৃতি নিয়েই এই আলোচনা করব, কেননা আজকের বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রযুক্তি মারফত গোটা বিশ্বকে এক সংস্কৃতির ছাঁচে ঢেলে সাজাবার যে চেষ্টা চলছে, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ফলে, মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আজ বিপন্ন। বিপন্ন ব্যক্তি মানুষের প্রাতিস্বিক সেই বোধ যা কেবল মানমর্যাদাই নয়, মানবিক উদ্ভাবনা ও কল্পনার স্বাভাবিক সৃজন ভূমি। তার জায়গায় প্রযুক্তি - ভিত্তিক এক অমানবিক বিশ্বায়িত লোভ এবং ভয়ের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা চলছে। সেই প্রবল হামলার সামনে মানুষের একলা হয়ে দাঁড়াবার ভূমিটাই আজ বেদখল হয়ে যেতে বসেছে। কবি শঙ্খ ঘোষের ভাষায় বলা যেতে পারে : নিয়ন আলোয় পণ্য হল যা কিছু আজ ব্যক্তিগত। নিজভূমে পরবাসী হয়ে উঠল মানুষ। এই প্রক্রিয়াটি, মানসলোকের মধ্যে 'সেজ' তৈরির এই প্রক্রিয়াটিকে আর চিনে নেওয়া জরুরি। প্রযুক্তির সংস্কৃতির এই ভয়াবহ দিকটিকে যথা সম্ভব উন্মোচন করা তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

রামপ্রসাদ বনাম রবীন্দ্রনাথ

এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা

ইংরেজি 'কালচার' ব্যাপারটির মধ্যে টেকনোলজি এবং টেকনোলজির মদ্যে তত্ত্বজ্ঞান, শব্দার্থগত বিচারে পাশাপাশি ছিল। ইংরেজি 'কালচার' কথাটির উপযুক্ত পরিভাষা খুঁজতে অথবা গড়তে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে একদা বিতর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেটা অনেকেই জানেন। সিভিলাইজেশন, ন্যাশনালিজম ইত্যাদি পরিভাষা তথা ধারণা নিয়েও যদিও এ ধনের তর্ক তোলার অবকাশ ছিল, প্রয়োজন ছিল, তবুও সে সব ততটা দানা বাঁধেনি। কিন্তু 'কালচার' -এ এসে তর্কটা ঘনিয়ে উঠল। উঠল বিশেষত এই কারণে যে আধুনিক বাংলা ভাষা ও কালচারের প্রাণপুরুষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই তর্কে জড়িয়ে পড়লেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃষ্টি কথাটিকে কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় চালু করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তা মোটেই পছন্দ হয়নি। কালচার শব্দটি লাতিন উৎসব থেকে উংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে। লাতিন ও ইরেজি উভয় সূত্রেই তার যোগ আছে কালটিভেশন বা কর্ষণের সঙ্গে। পূজা করা, শুদ্ধ করা, যত্ন করা, যত্ন সহকারে লালন এবং বর্ধন ঘটানো, লাতিন এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই এই শব্দটির অনুষঙ্গ। চাষ আর সভ্যতার এই মিলমিশ ও ঘনিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই মানতে পারেননি। অশিক্ষিত চাষার যা জীবনকর্ম সেই কৃষির মতো আদি কেজো প্রযুক্তি থেকে সুশিক্ষিত ও সুশীল বুদ্ধিজীবীর ভাল লাগার কাজ, অবসর এবং আনন্দের সৃজনকর্মকে নাড়ি কেটে আলাদা করাটা অতিশয় কাজের কাজ বলে তিনি বারবার আলোচনা করেছেন। এমনকি শেষে কৃষ্টি শব্দটিকে বিদ্রূপ করে তিনি এ প্রসঙ্গে রীতিমতো জেহাদি মনোভাবের পরিচয় রেখে গেছেন এমনটা বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে কালচারের যে সব বিকল্প প্রতিশব্দ চালু করতে চান তার মধ্যে ছিল চিৎপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকোর্ষ এবং চিত্তোৎকর্ষর মতো একপেশে এবং খটমট শব্দ। পরে প্রবাসীতে 'কালচার' শিরোনামের এক প্রবন্ধে তিনি কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি কথাটা মেনে নিতে বললেন, যেহেতু হিন্দি ও মারাঠির মতো প্রাদেশিক ভাষাতে কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি তাদের মহলে চালু হয়ে গেছে। কালচার বনাম কৃষ্টি বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রুতিমাধুর্যকে গুরুত্ব দেননি, সম্মান নামক ব্যাপারটিও ছিল তাঁর আপত্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু। অশিক্ষিত, সুশিক্ষিতের এই জাতিভেদ বাঙালির মানসিকতায় তখনও ছিল, এবং এখনও যে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিক্ষিত প্রায় সকল বাঙালি আজও জমিদারি ঘরানার মানসিক ঘোর, কেউ কেউ প্রকাশ্যে, বাকিরা গোপনে লালন করেন। আমরা সকলেই কমবেশি এই দোষে দুষ্ট।

রামপ্রসাদ কিন্তু অবলীলায় মনের আবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। আবাদ বনাম উৎকর্ষ বিবাদ তাঁর কাছে অবান্তর হয়ে গিয়েছিল। সেই রামপ্রসাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব যেন অনতিক্রম্য। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথই কি ইঙ্গবঙ্গ দুই কালচারে বিভাজনের হোতা অথবা অগ্রদূত? কালচার শব্দটি মূলে গিয়ে তিনি প্রযুক্তি বা আবাদ এবং কৃষ্টি বা উৎকর্ষসাধন, দুটোকে গোড়া কেটে আলাদা করতে সচেতন উদ্যোগ নেন এবং সফল হন। তার ছাপ বাংলা সংস্কৃতিতে আজও রয়ে গেছে। কালচার শব্দটির এই গুণগত সংকোচন সবচেয়ে বেশি করে ধরা পড়ে নৃতত্ত্ব এবং সামাজিকবিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে। জীববিজ্ঞানে জিনতত্ত্ব যতটা 'গুরুত্বপূর্ণ, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার কালচার টিক ততটাই গুরুত্ব দাবি করে। প্রযুক্তির সংস্কৃতিকে চেনবার জন্য সেটাই উপযুক্ত বিষয়ভূমি। ভক্তকবি হলেও রামপ্রসাদ যেন ঠিক সেই নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার আলোয় দেখেছিলেন সমাজ ও সভ্যতাকে।

একদা 'কালচার ও সংস্কৃতি' শিরোনামের প্রবন্ধে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য এই বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা শুরু করেছিলেন, যা তাঁর 'পরিপ্রশ্ন' নামের প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পেয়েছে। উৎসুক বাঙালি পাঠক এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে তাদের সেই প্রবন্ধটি দেখে নিতে বলব।

সংস্কৃতির রূপান্তর : কারা আছে আড়ালে?

নিছক তত্ত্ব নিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা পাণ্ডিত্যের না হোক, পণ্ডিতদের ব্যাধি। আলোচনার আগে চর্মচক্ষে চারপাশ জরিপ করে নেওয়াটা সেই রোগের মোক্ষম দাওয়াই। প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে আমাদের চারপাশের জনমানস কতখানি সচেতন তার হদিশ নেওয়াটা অংশত সেই কারণেও জরুরি।

প্রযুক্তির বাড়াবাড়ি সংস্কৃতির বারোটা বাজাচ্ছে, আজকাল বহু মানুষ এমন অভিযোগ আনে। সুতরাং, এই বিষয়টির দিকে প্রথমে খানিক দৃষ্টিপাত করে নেওয়া যাক। প্রযুক্তি সংস্কৃতির বস্ত্র হরণ করছে, ফলে সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে এমনটা যাঁরা বিশ্বাস করেন, বয়স্ক মানুষদের মধ্যে সম্ভবত তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যদিকে, অল্পবয়স্ক, তরুণ সম্প্রদায় আজকাল টেকনোলজির অন্ধ মোহবন্ধনে ক্রমশ নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দী করে ফেলছেন। জীবনানন্দের ভাষা ধার করে বলা যেতে পারে যে, এই তরুণদের উৎসাহকে পুঁজি করেই বৃত্তি আদায় করছে আজকের বাণিজ্য - জগৎ। টেকনোলজি আজ বিকিকিনির জগতের বনিয়াদ রচনা করেছে। টেকনোলজির জন্ম হচ্ছে যে ধরনের মগজ থেকে, তাদের কিনে, তার পণ্যায়ণ ঘটিয়ে, সেটা বেচা আজকের অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য। এবং সে সব পণ্য বেচার জন্য উপভোক্তা হিসেবে আমজনতার মগজকে এমনভাবে গড়ে পিটে নেওয়া হচ্ছে, যাতে তার এইসব নিত্য-নতুন পসরা না পেলে জীবনটাই বৃথা, এমন মনে করতে শুরু করে। সব মিলিয়ে আজকের বাণিজ্যের এই যে মূল প্রবণতা, একে অনেক সময় বলা হয় নলেজ ইকনমি, যার মারফত টেকনোলজি আজকের বাণিজ্য অর্থনীতির একেবারে কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে যৌনতা এবং সংস্কৃতিকে যেনতেন প্রকারে এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে বাইরে থেকেও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কেননা

মানুষের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা মোক্ষম দুটি অস্ত্র হল এই সেক্স এবং কালচার, এবং এদের সাহায্য ছাড়া আজকের প্রযুক্তি তাড়িত, অপ্রয়োজনীয় পণ্যবহুল কৃত্রিম জীবনধারা লাগাতার চালিয়ে যাওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়। ফলে, গোটা জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি ভরকেন্দ্র আজ যেন টলে গেছে। বয়স্ক মানুষরা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এই পরিবর্তন খুব পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারছেন। তাঁরা অনেকেই আজ তাই এই জীবনযাত্রা ও টেকনোলজির কট্টর সমালোচক। এইসব প্রযুক্তি তাঁদের কাছে দূষণ ও আবর্জনা বলে মনে হচ্ছে। এর ফলে ঘটে চলা সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন তাঁদের বিরক্তির এক প্রধান কারণ। আর, অন্যদিকে কচিকাঁচা, নবীন সম্প্রদায় মনে করছে, আজকের এই নিত্য নতুন চটকদার সেক্সি টেকনোলজিই হল সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা। সবার ওপর, বিজাপনের প্রবল দাপটে বস্তু ছেড়ে মোড়কের দিকেই এখন তাদের নজর আটকে গেছে। এই নতুন টেকনোলজির স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়েছে।

এর বিপরীতের আরেকটি প্রবণতা, এখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও, একেবারে মিলিয়ে যায়নি। এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল যেভাবে, কালে কালে তার চরিত্র যদিও অনেকটা বদলে গেছে। পশ্চিমের দেশগুলিতে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এই মনোভাব ভালরকম দানা বেঁধে উঠেছিল, আমাদের দেশে যা এসেছিল সত্তরের দশকে। প্রথম এর নামকরণ করা হয়েছিল 'কাউন্টার কালচার'। সোজা বাংলায় একে বলা যেতে পারে 'বিকল্প সংস্কৃতি'। তবে 'কাউন্টার' কথাটার যে ঝাঁঝ, সেটা 'বিকল্প' শব্দটির মধ্যে ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে না, একধরনের বোহেমিয়ান বাউণ্ডুলেপনা, শ্লীলতাকে ধাক্কা দেওয়ার যা স্ফূর্তি পেয়েছিলেন। নবীনদের মধ্যেও অল্পসংখ্যক হলেও কেউ কেউ ছিল যারা উপরোক্ত টেকনোলজির বাড়াবাড়ি এবং তার ফলস্বরূপ ঘটতে থাকা সাংস্কৃতিক রূপান্তর পছন্দকরেনি। যার জন্য তার অনেকেই এক ভিন্নতর বিকল্প সংস্কৃতির দিকে পা বাড়িয়েছিল। হিপি ও বিটনিকরা যার আইকন হিসেবে সেদিন উঠে এসেছিল। সেই মনোভাবনা আজ বিগত কয়েক দশকে, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর - আধুনিকতার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে— বিজ্ঞান এবং উচ্চ প্রযুক্তিকে রুখে দেওয়াটা যাদের স্বঘোষিত কর্মসূচীর এক নম্বর লক্ষ্য। পোষাক, আচার - আচরণ, যৌনতা, এসব ছাড়িয়ে আজ এদের বিরোধের সূচীমুখ এবং ধাক্কা দেওয়ার লক্ষটি, যে কারণেই হোক, হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি। তবে সব ক্ষেত্রে এরা যে পুরোপুরি টেকনোলজি বিরোধী, বা টেকনোলজি নিরপেক্ষ এমন নয়। দুঃখের বিষয় হল, নতুন নতুন প্রযুক্তির ফলে যে সব পুরনো প্রযুক্তি মার খায়, যাদের বাণিজ্য উঠে যেতে বসে, সেই সব কর্পোরেট হাউস যেন ক্রমশ হয়ে উঠেছে 'কাউন্টার কালচার' আন্দোলনের মদতদাদা, বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি বিরোধিতার স্পনসার। যৌনতা এবং নানারকম নেশা এদের সংস্কৃতির মধ্যেও সমানভাবে প্রবল। ফলে এই আন্দোলনগুলি আজ কতটা প্রযুক্তি বিরোধী তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। বাস্তবে বহুক্ষেত্রে, এইসব আন্দোলনের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন টেকনোলজির ছায়া - যুদ্ধ, পরোক্ষ লড়াই। অনেক ক্ষেত্রে, পরিবেশ বনাম প্রযুক্তির লড়াইয়ের বিকৃত চেহারাটা এখন যেমন স্পষ্ট হয়ে আসছে, তখন বোঝা যাচ্ছে এই ছায়াযুদ্ধে কারা আছে আড়ালে!

এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি গভীরে গিয়ে আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। হয়তো পরে কখনও শুধু এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

আমেরিকা : সংস্কৃতিহীন প্রযুক্তির পীঠস্থান

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক অর্থে সুষম বিকাশ ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। তাছাড়া বিকাশের কেন্দ্রটি বারে বারে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সরে গেছে। এর কার্যকারণ এখনও আমাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা, প্রযুক্তির অর্থনীতি চর্চা, এসব থেকে বিনিয়োগ এবং মুনাফার তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, এ কাজে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভরকেন্দ্রটি ইউরোপ থেকে আমেরিকায় সরে এসেছিল। আমেরিকার বাইরে, এশিয় মহাদেশে, জাপানে প্রযুক্তি বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল তাও এক কথায় বলতে গেলে তুলনাহীন। তবে দুটো ঠিক একরকম উপায়ে ঘটেনি। বিজ্ঞান জ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে বাস্তববাদী এবং সার্বজনীন হলেও তার বিকাশের পেছনে সমাজ সংস্কৃতির ভূমিকা এই ধরনের আঞ্চলিক অসম বিকাশের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন অনেকেই। দেশে দেশে বিকশিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মধ্যেও এর ছায়া লক্ষ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

যেমন অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে উনিশ শতকে ইউরোপে যে বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছিল তা ছিল মূলত এক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। প্রযুক্তি সেখানে উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল এই বিজ্ঞানের আঁতুরঘর। কিন্তু আমেরিকায় বিজ্ঞানকে গোড়া থেকেই প্রযুক্তির ইঞ্জিন হিসেবে দেখা গেছে। মার্কিন ধনকুবেরদের চোখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুটোই ছিল অর্থনৈতিক মূলধন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে মৌলিক বিজ্ঞানকে বিকশিত করার পরিচিত ইউরোপীয় পদ্ধতির বাইরে গিয়ে তাঁরা প্রথম থেকেই এমন কিছু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যারা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় ভারমুক্ত, ফলে অনেকটাই স্বাধীন। ফলে, এদের মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রের টাকায় প্রযুক্তি তৈরি করে তা কর্পোরেট হাউসগুলি হাতে তুলে দেবার পরিচালনা পদ্ধতিটি বিকশিত হল আমেরিকায়।

আমেরিকা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের গবেষণায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার চেষ্টা সেই কারণেই প্রথমে শুরু করেনি। প্রথম থেকেই তারা প্রযুক্তি উপযোগী মৌলিক গবেষণার ফলাফল ইউরোপ থেকে আমদানি করত, আর বেঞ্চে কাজ করবার মতো গবেষকদের আমদানি করত গোটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুনিয়া থেকে। এই কারণেই পোস্ট - ডক্টরাল ফেলো নামক বস্তুটি আমেরিকাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। ক্ষুদ্র একদল বিজ্ঞান ম্যানেজারদের কাজে লাগিয়ে আমেরিকার কর্পোরেট প্রযুক্তি ব্যবসায়ীরা এভাবে বিপুল মুনাফা অর্জনকারী একটি বিজ্ঞানসাম্রাজ্য তৈরি করে নেয়।

এসবের ফলে আমেরিকার গোটা সমাজটাই এখন বিজ্ঞানের চেয়ে প্রযুক্তিকে অনেক বেশি কদর করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, এক প্রযুক্তি পাগল অথচ বিজ্ঞান - অন্যমনস্ক, বিজ্ঞান উদাসীন সমাজ - সংস্কৃতি তৈরি করাটা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার অতুলনীয় কীর্তি। একে 'সংস্কৃতিহীন প্রযুক্তি' বলাটাই বোধহয় যুক্তসঙ্গত। অথচ অর্থনৈতিক সাফল্যের চূড়ায় বসে থাকার জন্য এই মনোভাবটাই সে আজ গোটা বিশ্বে অবলীলায় ছড়িয়ে দিতে পারছে। কানপুরের পদার্থবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান ও সমাজ আন্দোলনের এক প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক এ পি শুক্লা কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কল্টিভেশন অফ সায়েন্স -এ অনুষ্ঠিত প্রথম মহেন্দ্রলাল সরকার স্মারক বক্তৃতায় এই ঘটনাটিকে বলেছেন গ্লোবাল আমেরিকানিজম, বা সংক্ষেপে গামারিকানিজম।

গণপ্রযুক্তি ও গণসংস্কৃতি

একটা সময় পর্যন্ত নুতন প্রযুক্তি এমনকি সর্বসাধারণের উপযোগী হলেও সেটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সমাজপতি বা বাণিজ্যের জগৎ, কারও কাছেই বাঞ্ছিত ছিল না। তা যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখা, অর্থাৎ বিষম বন্টনটাই ছিল স্বাভাবিক। সেটাই তাদের কাছে লাভজনক বলে বিবেচিত হত। এটা বিশেষ করে চোখে পড়ত, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে। সমাজ উন্নয়নের জন্য, ন্যায়বিচারের দিক থেকে, যা অনেক সময় হয়ে উঠত একটা বড় সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ। আজ

অবস্থাটা সেদিক থেকে দেখলে অনেকটাই পালটে গেছে। প্রযুক্তিকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোটাই এখন বিশ্ব বড়বাজারের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রায় গোটা সমাজকে প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতিক, দুদিক থেকেই সমতায় টেনে এনে দাঁড় করানো, ক্রেতা এবং উপভোক্তা হিসেবে সমমনোভাবাপন্ন করে তোলাটাই, আজকের বিশ্ববাণিজ্যের কর্মসূচি। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য গোটা সমাজের ইচ্ছা এবং স্বপ্নগুলোকে দুরমুশ করে বা একছাঁচে ঢালাই করে সমান ভাবে গড়ে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, এ যুগের সংস্কৃতি ক্রমশ একান্তভাবে গণসংস্কৃতি বা মাস কালচার হয়ে উঠছে। গান, সিনেমা, সাহিত্য, টেলিভিশন সবেতেই এই একীকৃত পরিবেশন ও একীভূত জনরুচি ছাপ অতিশয় স্পষ্ট।

এর পাশাপাশি, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির নতুন নতুন পরিবর্তনগুলিও আজ দুনিয়ার সর্বত্র প্রায় একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ আগের যুগে এই প্রসারণ ছিল তুলনায় অনেক বেশি মন্থর এবং তা দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিত। প্রশ্ন ওঠে, এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বে যে সব সাংস্কৃতিক দেশকালগত বৈচিত্র্যের যুক্তি, লাগসই এবং টেকসই হবার পূর্বশর্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব যুক্তি এখন বিশ্বায়নের যুগে কী করে তাহলে বাতিল হয়ে গেছে? সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিশ্বায়নের প্রবক্তারা সেটাই দাবি করেন। তবে তাদের এই লক্ষ্য সার্থক হবে কিনা বলার সময় এখনও আসেনি। এখনও, বিশ্বায়িত গণসংস্কৃতির সঙ্গে দেশিয় এবং লৌকিক সংস্কৃতির সংগ্রাম অব্যাহত আছে। অনেক ক্ষেত্রেই জনসমাজের একটা বড় অংশ বিশ্বায়িত প্রযুক্তির এবং সংস্কৃতিকে খোলাখুলি অনৈতিক বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে, এর মোকাবিলা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের মতো প্রযুক্তিকেও আজকাল মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বলে দেখাবার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে অনেকেই এ সব প্রচারে বিশ্বাস করে ফেলেছেন। যাঁরা এ সব প্রচারে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে হচ্ছে, প্রযুক্তিকে ভাল বা মন্দ যে কোনওভাবেই ব্যবহৃত করা যায়, মনে করেন, প্রযুক্তি দেশ বা সমাজ-নিরপেক্ষ, নৈতিক - অনৈতিক কোনও তকমাই প্রযুক্তির গায়ে সেঁটে দেওযা যায় না। প্রযুক্তি সত্যিই কি ঠিক তাই? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা আবার খানিক তত্ত্বকথার কচকচিতে প্রবেশ করব। তাকাব সামাজিক ইতিহাসের দিকে।

প্রযুক্তির মূল্যবোধ

প্রযুক্তি যখন সামাজিক বা লোকজ্ঞান সম্ভূত ছিল তখন অনেক সময় গাঁটের কড়ি না খসিয়েও তার সুফল বা তা ব্যবহারের অধিকার পাওয়া যেত। যখন থেকে বিজ্ঞানশালা হয়ে উঠেছে প্রযুক্তির আঁতুরঘর তখন থেকে সেই অধিকার হারিয়ে গেছে। প্রযুক্তির পণ্যমূল্য বেড়ে গেছে। পুঁজিবাদী মেধাসত্ত্বের নিয়মে তা রীতিমতো দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। তবু প্রযুক্তির মূল্য নির্ধারণ করা যত শক্ত। প্রযুক্তির মূল্যাবোধের হিসাব নেওয়া বোধহয় তার চাইতেও কঠিন। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গাঁটছড়া স্বীকার করে, বিজ্ঞানের দিক থেকেই ব্যাপারটা বুজে নেবার চেষ্টা করা যাক।

অনেকে আপত্তি তুলবেন জেনেও বলব, বিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ মোটেই নয়। বলব এ কারণেই, কেননা, বিজ্ঞান শুধু যে মানুষের কৌতূহল মেটায় তাই নয়, তা মানুষের মূল্যবোধ পালটে ফেলতে সহায়তা করে। বিজ্ঞান এই কাজটা করে দু'ভাবে। এক, তা পরিচিত সংস্কৃতির চেনা পরিমণ্ডলে নতুন আইডিয়া বা ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটায়। অনেক সময় তা পুরনো চিন্তাধারার ভিত নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অনেক সময় নতুন কল্পনা, বিকল্প ভাবনা উপস্থাপিত করতে চায়। ফলে সমাজ - সংস্কৃতির মূল্যবোধের অচলায়তন ঘা খায়, ঠেলা খায় বা টলমল করে ওঠে। ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি, আর তার সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ এভাবেই পাল্টায়। এটা বিজ্ঞানের একটা অতি বড় সামাজিক ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্ম দেয়। সেইসব প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যাপারটাই পাল্টে দিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এর ফলেও সমাজ - সংস্কৃতি-মূল্যবোধ পাল্টায়। সুতরাং, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তি দু'য়ের ভূমিকায় অপরিসীম। তাই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাবার পেছনে কলকাঠি যদিও নাড়ে প্রযুক্তি, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এই প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, বাণিজ্যের প্রয়োজনে দোহন করে যারা, তারা ব্যাপারটিকে আড়ালে রাখতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে স্বচলিত, নিরালম্ব, স্বাধীন এবং মূল্যবোধ বর্জিত বলে প্রচার করে। এই আলোচনায় সেই আড়ালের ইঙ্গিত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রযুক্তির সংস্কৃতি ও ভারতবর্ষ

আজকের বিশ্বে দেশে দেশে এবং উত্তর গোলার্ধ বনাম দক্ষিণ গোলার্ধে জীবনযাত্রার মান ও উন্নয়ন এবং অর্থনীতির নিরিখে যে ধরনের ঘোরতর বৈষম্য বিরাজ করছে এবং যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসম বিকাশকে দায়ী করা যায়। এই বৈষম্য সমাজ এবং সভ্যতার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত প্রযুক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির নাগরিকদের আচার এবং আচরণের মধ্যে প্রায়ই ফুটে ওঠে বহুতর পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতির রোগলক্ষণ। এই পতন এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে কীভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করব, কী করে এই দশা থেকে মুক্তি পাব সেটা আমাদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি গোড়া থেকেই উন্নত দেশগুলি থেকে টেকনোলজি আমদানি করাটাকে এর মূল্য সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে, রাজনৈতিক প্রচারের লক্ষ্যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র উৎপাদকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে, ষাট এবং সত্তরের দশকে 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি' আমদানি করাটাকে এর মূল সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে, রাজনৈতিক প্রচারের লক্ষ্যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র উৎপাদকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে, ষাট এবং সত্তরের দশকে 'অ্যাপ্রোপিয়েট টেকনোলজি' বা 'লাগসই টেকনোলজি'র নীতি সম্প্রসারণের অন্যতম প্রবক্তা শুমেকারকে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে একসময় যুক্ত করা হলেও তিনি ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের এই দায়সারা মনোভাব বুঝে দ্রুত মানে মানে কেটে পড়েন। অতঃপর সেই অধ্যায়টিতে কার্যত ইতি টানা হয়। রাজীব গান্ধীর আমলে এসে শুরু হয় তথ্যপ্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তির মতো অগ্রসর অতি - উন্নত প্রযুক্তিকেই এ দেশের আমজনতার জন্য লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে প্রচার করা। করদাতাদের টাকা উচ্চবিত্তদের শিক্ষাখাতে এবং ধনকুবেরদের ব্যবসা বাণিজ্যে দান - খয়রাত করার সুচতুর কৌশল এসময় থেকে পুরোদস্তুর চালু হয়।

আজ বিশ্বায়নের যুগে সেই প্রবণতা অনেক গুণ জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলির উন্নত শিল্প ও প্রযুক্তিকে আমাদের উন্নয়নের একমাত্র উপায় হিসেবে ফলাও করে তুলে ধরা হচ্ছে। মজার কথা হল, এদের রূপায়ণ এ দেশে কতটা সম্ভব সেই প্রশ্ন বাদ দিলেও আরেকটা বড় প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্নটি হল, পশ্চিমের যে প্রযুক্তিকে আমরা আমাদের সর্বরোগহর দাওয়াই বলে ধরে নিয়েছি, খোদ পশ্চিমেই আজ বহু মানুষ সেই সব প্রযুক্তিকেই তাদের সমাজের মূল ব্যাধি হিসেবে শনাক্ত করেছেন কেন? আমাদের দেশের সমাজের তুলনায় পশ্চিমের অনেক বেশি হৃদয়হীন সমাজও যে সব প্রযুক্তিকে অমানবিক এবং অসংস্কৃত বলে আপত্তি তুলছে, তাকে ঘরে আনবার আগে অনেক বেশি চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। অথচ সেই সব প্রশ্ন কী করে যেন মাঝপথে ভ্যানিশ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্ধের মতো। এই পথে এগোলে আমাদের আত্মপরিচয় যে অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কেননা, যাঁরা প্রযুক্তির বিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা এটাই দেখছেন যে ব্যক্তি মানুষের মতো প্রতিটি জনসমাজের মধ্যে, কৌমের মধ্যেও বিরাজ করের একধরনের প্রায় জেনেটিক কোড স্পষ্টত ধরে রাখা থাকে। তাই পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের সমাজে দ্রুত ব্যাপক

আকারে অনুপ্রবিষ্ট করানো হলে, চাপিয়ে দেওয়া হলে, আমাদের সমাজ অবশ্যই পশ্চিমের সভ্যতার এক হাইব্রিড ও ক্যারিকেচারে পরিণত হবে। যার খানিক লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, আমাদের উন্নয়নের যাবতীয় আলোচনা যেহেতু অর্থনীতি ও রোজগার কেন্দ্রিক, তাই প্রযুক্তির সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা সেখানে অবান্তর হয়ে উঠছে।

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাখা ভাল, সবরকম প্রযুক্তির জন্য আমাদের দেশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক, এই দাবি আমি মোটেই করছি না। আমার মতো, যা করা উচিত তা হল দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রযুক্তির বীজ দেশের মাটিতে বপন করা। তাদের বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের সমাজ এবং জনসমাজ করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনে তাদের মধ্যে এমন কিছু রদবদল ঘটানো যাতে তারা সুস্থায়ী অর্থাৎ টেঁকসই হতে পারে। এটা করতে গেলে আমাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনাশক্তিকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে সব প্রযুক্তি এর মধ্যে দিয়ে লাগসই (অ্যাপ্রোপ্রিয়েট) এবং টেঁকসই (সাসটেইনেবল) বলে প্রমাণিত হবে দেশের মানুষ তাদের সহজেই গ্রহণ করবে। আর এদের বেশ কিছু যে ব্যর্থ হবে সেটাও অবধারিত। তা না করে আমরা এখন গ্রাফট বা কলম করে নির্বিচারে নানারকম প্রযুক্তি আমদানি করে এখানকার যে কোনও গাছে জুড়তে চাইছি। এদের অধিকাংশ বিফল হতে বাধ্য, যা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর। যা ফসল হবে, তাও দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা, হলে কী প্রভাব ফেলবে তা সন্দেহজনক। আমার আপত্তি সেইখানেই। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে প্রযুক্তি আমদানির নীতি পালন করলে তাতে হিতে বিপরীত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা ?

রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত কবিতার লাইন তুলে এনে আরেক ভিন্ন অর্থের ব্যবহার করে, যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনায় আপাতত ইতি টানতে চাই তা হল সীমার প্রশ্ন। অনেকের মতে, এ হল সীমা ছাড়ানোর সমস্যা। এঁরা মনে করেন, জগৎ ও জীবনের অন্য অনেক কিছুর মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একটা সীমা থাকা দরকার। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতায় এখনই রাশ টানতে তৈরি। একদল পরিবেশের দোহাই দিয়ে এটা করতে চান। একদল তা চান আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের দোহাই টেনে। আর পোস্টমডার্ন চিন্তাধারা বিজ্ঞানের ক্ষমতাকেই শত্রু হিসেবে দেখে এবং ঠিক এরকম দাবি তোলে। এদের আপত্তির অনুষঙ্গগুলি যদিও মোটেই একরকম নয়। প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাই আমাদের আজ অনেকটাই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

প্রযুক্তিকে যদি সীমার বাঁধনে বাঁধতেই হয়, আমার মতে তা হলে একমাত্র সংস্কৃতিই সেই সীমা টানতে পারে। ইতিমধ্যে ইউরোপের বহু দেশে জিনপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এরকম সীমা টেনে দিয়েছে—জাতিবাদী, বর্ণবাদী, ইউজেনিক্স তত্ত্ব ও ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতির অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী, তাকে জিনের বাঁধনে বাঁধা, জিনের ছাঁদে ঢেলে সাজানোয় তাই ইউরোপের আপত্তি ক্রমশ ঘোরতর ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও দেশে জিন প্রযুক্তি, এমনকি জিনান্তরিত খাবারদাবারগুলিও বেআইনি বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন সে দেশের নাগরিক সমাজ। তাদের আপত্তি কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা, কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয়, তাদের আপত্তির মূল জায়গাটা হল মানব সংস্কৃতির বোধ। তাদের ভয়, এই প্রযুক্তি যে সংস্কৃতিতে ডেকে আনছে তা মানুষের মানবিক মর্যাদাবোধ, আত্মপরিচিত এবং প্রাতিস্বিকতাকে লঙ্ঘন করতে উদ্যত। ক্লোনিং নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে তার মূলেও ছিল এই সংশয়। পরিবেশবাদীরা যেমন পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে আগামীকালের জন্য যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রেখে যেতে চান, তেমনি জিনপ্রযুক্তির যাঁরা একান্ত বিরোধী তাঁদের ব্রত হল মানবিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, মানবিক বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা। এবং সেই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা। এবং সেই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি মানুষ এবং গোটা মহাবিশ্বের জৈবজগৎ এবং অজৈব প্রকৃতি নিয়ে তৈরি। কিন্তু যে কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষা জৈবপ্রযুক্তির প্রেক্ষাপট রচনা করেছে তার মূলেও কি নেই শিল্প ও সংস্কৃতির প্রেরণা ? যে জার্মানিতে আজ জিনপ্রযুক্তি জনমতের সামনে কোণঠাসা সেই জার্মানিতে স্বয়ং গ্যয়টেকে জৈবপ্রযুক্তির স্বপ্নদ্রষ্ট ও চিন্তক হিসেবে দেখানো যায়। উদ্ভিবদ চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন উদ্ভিদের প্রাণরাসায়নিক বস্তু দিয়ে উদ্ভিদকে ইচ্ছেমত রূপান্তরিত করে নেওয়া যায়, এদের আকারে মেটামরফসিস ঘটানো যায়, তা জানার ঔৎসুক্য। এ নিয়ে তিনি দিনের পর দিন চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। জীবজগৎকে বৈজানিক উপায়ে বংশগতভাবে গড়ে পিটে নেওয়াটা গ্যয়টের কাছে মহত্তম শিল্পকর্ম, মানবজাতির সাংস্কৃতিক উদ্দিষ্ট বলেই মনে হয়েছিল।

এ ব্যাপারে গ্যয়টে ব্যতিক্রমী মোটেই নন। শিল্প এবং সংস্কৃতি, প্রকৃতিকে বদলে ফেলাটা কল্পনার প্রয়োজন ও বাস্তব প্রয়োজন কোনও কারণেই অবান্তর বা সীমা ছাড়ানো ঘটনা বলে অতীত মনে করেনি, হয়তো ভবিষ্যতও করবে না। তবে এদের সামাজিক অভিঘাত নিয়ে যে তাঁরা সবাই চিন্তা ভাবনা করছেন এমনটাও নয়। তাই প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির জগতে কোন কোন পরিবর্তন কাঙ্খিত, কোন কোন পরিবর্তন অনাকাঙ্খিত, তা বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে একে একে বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ঢালাও অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা কোনওটাই জারি করা ঠিক হবে না। রোবটিক্স এবং ন্যানো - টেকনোলজির ক্ষেত্রেও এই যুক্তি খেটে যায়।

উপসংহারে বলতে চাই, বিশ্বকে আগামী যুগের মানব শিশুদের জন্য বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি চাইছেন অনেকেই। কবি সুকান্তের ছিল বিশ্বকে বাসযোগ্য করে তোলার দাবি। যদিও দ্বিতীয় দাবিটি এখনো মেটানো যায়নি, তবু প্রথম দাবিটিও ফেলে দেবার মতো নয়। দুটি দাবি যে পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক, সেটাই আমাদের কথায় এবং কাজে প্রমাণ করতে হবে।